ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টারে ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ

● ইসমাইল মাহমুদ

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে শেরপুরের রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিসেনাদের সিলেট অঞ্চলে প্রথম সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয় সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার মিলনস্থল শেরপুরে। সেই যুদ্ধে সিলেট অঞ্চলে প্রথম শহীদ হন বীর মুক্তিযোদ্ধা মহফিল হোসেন ও হাফিজ উদ্দিন। প্রায় দেড় দশক আগে সেখানে মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের উদ্যোগে নির্মাণ করা হয় একটি স্মৃতিস্তম্ভ। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিনই বুলেট আকৃতির এ দৃষ্টিনন্দন স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে আসেন অসংখ্য মানুষ।

জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই মুক্তিযুদ্ধ চত্বরে রয়েছে একটি সাইনবোর্ড, যেখানে লেখা রয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ চত্বরে সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন লাগানো নিষেধ। –আদেশক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার।' কিন্তু এ সাইনবোর্ড ও পুরো মনুমেন্ট ঘিরে ফেস্টুন, ব্যানার, পোস্টার সাঁটানোর রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে। পুরো মনুমেন্টকে আড়াল করে ফেলা হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতাদের ফেস্টুন-পোস্টারে। এমনকি ফেস্টুন, ব্যানার, পোস্টারের কারণে এ মনুমেন্টের নামই দেখা যায় না। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের এক কর্মকর্তা জানান, 'প্রায়ই রাজনৈতিক দল ও নেতাদের নামে সাঁটানো ফেস্টুন, ব্যানার, পোস্টার অপসারণ করা হয়। অপসারণে পদক্ষেপ নেয়া হলেও যারা এসব লাগান তারা সবাই প্রভাবশালী বলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়ে ওঠে না।' তিনি মনে করেন যারা এসব কর্মে জড়িত তারা যদি এ স্থানের গুরুত্ব অনুধাবন না করেন তবে তাদের নিবৃত্ত করা যাবে না। ছবি : মাহফুজ সুমন

চিকিৎসাবর্জ্যে জনস্বাস্থ্য হুমকিতে

● ইয়াসমীন রীমা

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার পৌর শহরে ছোট-বড় ১৮টি প্রাইভেট হাসপাতাল-ক্লিনিক রয়েছে। কিন্তু এসব হাসপাতালের নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। সরকারিভাবে 'চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা-২০০৮' কার্যকর থাকলেও লাকসামের বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলো এ বিধান মানছে না। হাসপাতালের বর্জ্য সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কড়া নির্দেশ থাকলেও হাসপাতালের মালিকরা যেমন তা মানছেন না, তেমনি জেলা সিভিল সার্জনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও নীরব ভূমিকা পালন করছে।

দৃশ্যত লাকসামের হাসপাতালগুলোর নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিংবা এ সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো ধারণাই নেই এবং চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয়রা চিকিৎসাবর্জ্যের সংস্পর্শে এসে নানা জটিল রোগ বয়ে নিচ্ছেন বাড়িতে। এখানকার হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিকের চিকিৎসাবর্জ্যগুলো সরাসরি পৌরসভার ডাস্টবিন কিংবা পার্শ্ববর্তী নদী-খাল ও ড্রেনসহ খোলা জায়গায় ফেলা হচ্ছে। হাসপাতালের বর্জ্যে মারাত্মক জীবাণু থাকে বলে ওই বর্জ্য আলাদা পাত্রে রাখা এবং তা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ বিধান কেউ মানছে না। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, গৃহস্থালি বর্জ্যের চেয়ে হাসপাতালের বর্জ্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। বিশেষ করে সিরিঞ্জ ও স্যালাইনের ব্যাগ হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'সহ বেশ কিছু রোগের জীবাণু ছড়ায়। এ ব্যাপারে লাকসাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সালাউদ্দিন জানান, লাকসামের বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক মালিকপক্ষ সরকারি কোনো নিয়ম-নীতি মানতে চায় না। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

সুভাষ বিশ্বাসের সুন্দরবন জাদুঘর

● শুভ্র শচীন

সালটি ১৯৮৬। সুভাষ বিশ্বাস জানতে পারেন সুন্দরবনে জেলেদের জালে দুটি ছোট কুমির ধরা পড়েছে। তিনি জেলেদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে কুমির দুটি কিনলেন। অফিসের কাছেই ছোট্ট এক পুকুরে কুমির দুটি পুষতেও শুরু করলেন। কিন্তু এক সময় মারা গেল সাধের কুমির। অগত্যা তিনি কুমির দুটিতে রাসায়নিক প্রয়োগ করে কাচের পাত্রে সংরক্ষণ করলেন। ১৯৮৭ সালে একদিন রসময় নাথ নামের এক জেলেকে বড় একটি বোতল দিয়ে বললেন, খাওয়ার মাছ ছাড়া অন্য যেসব জলজ প্রাণী জালে উঠবে তার সবই যেন এ বোতলে জমানো হয়। রসময় নাথ করলেনও তা-ই। এভাবে

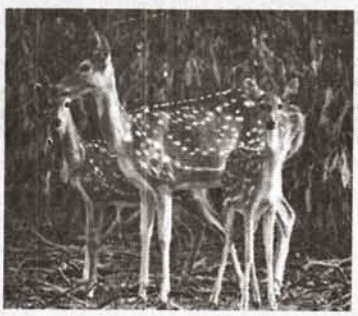

সুভাষ তার সংগ্রহের ভা-ার গড়ে তুলেছেন। তিনি আরো সংগ্রহ করেছেন চিল, বাদামি বিদ্যুৎ, সাগর লেবু, চোঘাতু-া, শাপলা পাতা, ফলি চাঁদা, ভুতুম মাছ, উড়ুক্কু, ঘোড়া মাছ, কালিমা, কাইন, মাগুর, হাঙ্গরসহ বিভিন্ন ধরনের মাছ। এগুলো তিনি অতি যত্নে নিজের বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে শুরু করেন।

একদিন তার এ সংগ্রহশালা দেখতে হাজির হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের এক শিক্ষক। তিনি সংগ্রহশালাটি দেখে বললেন, 'এসবের বেশিরভাগই এখন প্রায়-বিলুপ্ত।' এই শিক্ষকের উৎসাহে সুভাষের উৎসাহ-উদ্দীপনা আরো বেড়ে যায়। এসব সংগ্রহ দিয়েই সুভাষ বিশ্বাস মংলা শহরের প্রধান সড়কে প্রতিষ্ঠা করেন সুন্দরবন জাদুঘর। সেখানে স্থান পেয়েছে সুন্দরবনের পশুপাখি, গাছগাছালি, মাছ, স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যবহৃত সামগ্রীসহ স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকজ সংস্কৃতি, বিলুপ্তপ্রায় ব্যবহার্য সামগ্রী, ডাকটিকিট, মুদ্রা ও পোস্টকার্ড।